সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা (Authors of Indus valley civilization):

প্রাচীন বিশ্বে হরপ্পা সভ্যতার মতো এমন একটি উন্নত সভ্যতার স্রষ্টা কারা-এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্যের অন্ত নেই। (১) অনেকের মতে, সুমেরীয়রা এই সভ্যতার স্রষ্টা। (২) অনেকে এ সম্পর্কে দ্রাবিড়দের কথা বলেন। (৩) অনেকের মতে আর্যরা এই সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। (৪) অনেকে আবার এ সম্পর্কে ব্রাহুই, অসুর, নাগ, পণি, ব্রাত্য, দাস প্রভৃতি জাতির কথা বলেন। আসলে এ ব্যাপারে তথ্যাদি অতি কম। এছাড়া হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে যত মতামতই প্রকাশিত হোক না কেন, তাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

(১) এক সময় মনে করা হত যে মেসোপটেমিয়া বা সুমেরের লোকেরাই হরপ্পা সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। স্যার মর্টিমার হুইলার এবং গর্ডন চাইল্ড এই মতের সমর্থক। এ সময় দুই সভ্যতার নগর জীবন, কৃষিকার্য পশুপালন, ধাতুবিদ্যা, বস্ত্রবয়ন, ইট ও পাথরের কাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ের সাদৃশ্য তুলে ধরা হত। হুইলার বলেন যে, হরপ্পা-সংস্কৃতি সুমেরীর সভ্যতার কাছে ঋণী এবং সুমেরীয় সভ্যতাই সিন্ধু অববাহিকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল মাত্র তাঁর মতে, এই সভ্যতা বিদেশাগত বলেই এটি কেবলমাত্র ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল-ভারতের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয় নি। (অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড-এর মতে, উভয় সভ্যতার শিকড় এক) বলা বাহুল্য উভয় সভ্যতার মধ্যে বৈসাদৃশ্যও নেহাত কম নয়। মৃতদেহ সৎকার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যরীতি, মৃৎপাত্র, সিলমোহর, লিপি, নারীদের কেশবিন্যাস প্রভৃতি দিক থেকে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় সভ্যতাই স্থানীয় ও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্তিক আবি আবিষ্কারের ফলে হরপ্পা সভ্যতার গঠন ও বিকাশে বিদেশি প্রভাবের মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। মার্শাল, ব্যাসাম প্রমুখ মনে করেন যে, বিদেশি কোনো প্রভাব নয়-স্থানীয় সংস্কৃতিই হরপ্পা সভ্যতার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। ডঃ ব্যাসাম বলেন যে, হরপ্পার নগরগুলি যারা নির্মাণ করেছিল তারা ছিল সম্ভবত বহু শতাব্দী ধরে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী। হরপ্পা সভ্যতার মানুষগুলি যখন তাদের এইসব শহরের পরিকল্পনা হাতে নেয়, তখন তারা সম্পূর্ণত ভারতীয়। অলচিন-দম্পতি (ব্রিজেৎ অলচিন ও রেমন্ড অলচিন) মনে করেন যে, বৈদেশিক প্রভাব অপেক্ষা স্থানীয় সংস্কৃতিই ছিল হরপ্পার নগরগুলির উদ্ভবের স্তম্ভ। (যদি সেখানে কোনো বৈদেশিক প্রভাব থাকে তবে তা উদ্ভবের সময় পড়ে নি-পড়েছিল বিকাশের কালে।

(২) (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেও হেরাস (Rev. Heras), ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ব্যাসাম প্রমুখ দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের মতে দ্রাবিড় জাতিই এই সভ্যতার স্রষ্টা। (ক) আর্য আগমনের পূর্বে দ্রাবিড়রা উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতে বাস করত। আজও বেলুচিস্তানে ব্রাহই বলে একটি উপজাতি আছে, যারা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে। সম্ভবত এরা দ্রাবিড়দেরই একটি গোষ্ঠী। (খ) ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে, আর্যরা একটি অনার্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করেছিল। সম্ভবত এই অনার্য গোষ্ঠী হল দ্রাবিড়রা) (গ) (সিন্ধুলিপির সঙ্গে প্রাচীন তামিল লিপির যথেষ্ট মিল আছে। (ঘ) ধর্মের দিক থেকে দুই সভ্যতার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। হরপ্পা সভ্যতার মতোই শিব, শক্তি, লিঙ্গ ও যোনি পূজা দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রচলিত।) (ঙ) দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় ও প্রোটো-অস্ট্রালয়েড মানুষের মিশ্রণ দেখা যায়। সিন্ধু উপত্যকায় এই দুই জনগোষ্ঠীরই সংখ্যাধিক্য ছিল। (চ) জাঁ ফিলিওজা বলেন যে, হরপ্পা সভ্যতা ছিল উন্নত ও বাণিজ্য-নির্ভর। প্রাক্-আর্য যুগে মুন্ডা ও দ্রাবিড়রাই ছিল ভারতের প্রধান জনগোষ্ঠী। মুন্ডাদের উন্নত সভ্যতা ছিল না। সুতরাং দ্রাবিড়রাই হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা। বলা বাহুল্য, হরপ্পা সভ্যতার দ্রাবিড়ীয় উৎপত্তি মতবাদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ উঠেছে। বলা হয় যে, (ক) হরপ্পাবাসী ও দ্রাবিড়দের শব-সৎকারের পদ্ধতি পৃথক। (খ) দ্রাবিড়রাই যদি হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা হয়, তাহলে দ্রাবিড় সভ্যতার পীঠভূমি দাক্ষিণাত্যে হরপ্পা সভ্যতার অনুরূপ কোনো নাগরিক

সভ্যতার বিকাশ ঘটল না কেন?) (গ) (ব্রাহুইরা তুর্কো-ইরানীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। জাতিগত দিক থেকে তারা দ্রাবিড়দের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং এ মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়।)

(৩) এ. ডি. পুসলকার (A. D. Pusalkar), এস. আর. রাও (S. R. Rao), অলচিন-দম্পতি প্রমুখ দেশি-বিদেশি ঐতিহাসিক মনে করেন যে, আর্যরাই হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা। গর্ডন চাইল্ড, জন মার্শাল, ব্যাসাম প্রমুখ ঐতিহাসিকরা অতি দৃঢ়তার সঙ্গে এই মতবাদ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, এই দুই সভ্যতার মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পার্থক্য যথেষ্ট। জন মার্শাল বলেন যে, সিন্ধু সভ্যতা আর্য সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন এবং ভিন্ন প্রকৃতির) (ক) আর্য সভ্যতা গ্রামীণ, কিন্তু হরপ্পা সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক। (খ) আর্যরা সোনা, তামা, ব্রোঞ্জ ও সম্ভবত লোহার ব্যবহার জানত, কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার মানুষ লোহার ব্যবহার জানত না) (গ) (আর্যরা বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র ব্যবহার করত, কিন্তু হরপ্পা সভ্যতায় এগুলি ছিল না) (ঘ) হরপ্পার নগরগুলিতে বাণিজ্য ও শিল্পই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা। আর্যদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন ও কৃষি। (ঙ) ঘোড়া আর্যদের কাছে গৃহপালিত ছিল, কিন্তু হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়া ছিল প্রায় অজানা।) (চ) সিন্ধুবাসী শিব ও মাতৃপূজা করত। আর্যদের কাছে এগুলি ছিল গৌণ। সিন্ধুবাসী লিঙ্গ, যোনি ও মূর্তিপূজা করত। আর্যদের কাছে এগুলি নিন্দনীয় ছিল। এইসব কারণে জন মার্শাল সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা হিসেবে আর্য-দাবি নাকচ করে দিয়েছেন।

৪) এ ব্যাপারে অনেকে পণি, অসুর, ব্রাত্য, দাস, নাগ প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর কথা বলে থাকেন। এ ব্যাপারে পণ্ডিতদের হাতে তথ্যাদি এত কম যে, এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

(৫) সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুলির নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা এখানে চারটি জনগোষ্ঠীর মানুষের সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলি হল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপাইন ও মোঙ্গলীয়। কঙ্কালগুলির সংখ্যা এত কম যে, সেগুলি থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয় যে, হরপ্পা সভ্যতা বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা সৃষ্ট হয় নি-বিভিন্ন জাতির মানুষের প্রচেষ্টায় এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি নৃতাত্ত্বিক ডঃ ডি. কে. সেন এই অঞ্চলের কঙ্কালগুলি নতুন করে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, এখানে একটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষই বাস করত। তারা হল এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের বংশধর এবং তারাই এই সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। আবার এও বলা হয় যে, রয়েছে। মহেঞ্জোদারোর নীচের দিকে কয়েকটি স্তর এখনো জলমগ্ন থাকায় সেখানে কোনো পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয় নি। এছাড়া হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এখনো সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সাহায্যে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় রীতিনীতি:(Religious Practises of Indus Valley Civilization):

হরপ্পা সভ্যতার মতো বিশাল সভ্যতায় ধর্মব্যবস্থা কেমন ছিল অর্থাৎ তৎকালীন মানুষ কিভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত, কোন্ ধর্মের প্রতি তাদের আসক্তি ছিল প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তথ্য খুবই অপ্রতুল। কারণ, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো অথবা অন্য কোনো শহর থেকে দেবায়তনের কোনো স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এছাড়া সিলমোহরগুলিতে উৎকীর্ণ লিপিগুলির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় সেগুলিও এ সম্পর্কে নীরব। এতসত্ত্বেও বিভিন্ন শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত মাতৃ মূর্তি, কিছু লিঙ্গজাতীয় প্রতীক, মহেঞ্জোদারোর স্নানাগারটির উপস্থিতি ও সিলমোহরগুলি আলোচ্য সভ্যতার ধর্মীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সিলে একটি নগ্ন নারীমূর্তি অঙ্কিত আছে। এই মূর্তিটির মাথা নীচের দিকে এবং পা দুটি ওপর দিকে উত্থান ভঙ্গিতে অঙ্কিত। একটি চারাগাছ ঐ নারীমূর্তির গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে। মনে হয়, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ইঙ্গিত তুলে ধরা হয়েছে এই মূর্তিটির মাধ্যমে। ঐ সিলমোহরটির অপরদিকে একটি দেবীমূর্তির সামনে নরবলি দেবার চিত্র উপস্থিত। আবার অনেক সিলমোহরে গাছপালার উপাসনার নিদর্শন বিদ্যমান। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, একটি সিলমোহরে অঙ্কিত একটি পিপুল গাছের মাঝখানে উপবিষ্ট একজন দেবতার ছবি।

জীবজন্তুর পূজা করার রীতি হরপ্পা সভ্যতার যুগে প্রচলিত ছিল। জীবজন্তুর মধ্যে কুঁজবিশিষ্ট ষাঁড়ের পূজার প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। আর একটি সিলমোহরে একটি পুরুষ দেবতার ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পুরুষ দেবতার চারদিক পশুর দ্বারা বেষ্টিত। তিনমুখ বিশিষ্ট এই পুরুষ দেবতা যোগাসনে উপবিষ্ট। আধুনিক কিছু ঐতিহাসিক এঁকে পরবর্তীকালের শিবের আদি পর্যায়ের কোনো দেবতারূপে গণ্য করে থাকেন। এছাড়া, পাথরের তৈরি অজস্র লিঙ্গ ও যোনির প্রতীকের পরিচয় মিলেছে। এগুলি উর্বরা শক্তির পরিচয় দেয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় যে পোড়ামাটির মাতৃকা মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলির কটি প্রদেশে একটি সাধারণ আবরণ ছাড়া বাকী অংশ নগ্ন, একথা আগে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই মূর্তিগুলিতে মাতৃত্বসূচক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ প্রকটভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রচলিত এইসব ধর্মব্যবস্থা থেকে মনে হয় যে, ভারতের প্রাচীনতম ধর্মব্যবস্থায় মাতৃকা পূজা প্রাধান্য লাভ করেছিল। এছাড়া সৃষ্টির মূলে পুরুষ ও স্ত্রী আদর্শের সংযোগ এবং যোগ-সাধনা এই ধর্ম ব্যবস্থার মূলে কাজ করেছিল। অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন যে, সামগ্রিকভাবে ঐ সমস্ত বিষয়গুলির দ্বারা এমন একটি ধর্মীয় * ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যাকে আদিম তান্ত্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

হরপ্পা সভ্যতায় শিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন ঘটেছিল বলে মনে হয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল অজস্র সিলমোহরের ওপর উৎকীর্ণ লিপিগুলি। যদিও এগুলির সঠিক পাঠোদ্ধার এখনো হয়নি, তথাপি এগুলি যে একটি শিক্ষিত সমাজের পরিচয় দেয় সে-বিষয়ে খুব কমই সংশয় রয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় পৃথিবীর প্রাচীনতম চারটি লিপির একটি হল সিন্ধুলিপি। এর উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায় না। সব মিলিয়ে সিন্ধুলিপির সংখ্যা প্রায় চার হাজার। প্রত্যেক শিলালিপিতে গড়ে পাঁচটি করে চিহ্ন দেখা যায়। এগুলি লেখা হত সাধারণভাবে ডান থেকে বাম দিকে। অবশ্য কখনো কখনো দ্বিতীয় সারিটি বাম থেকে ডান দিকেও গেছে। তবে পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

হরপ্পীয়রা যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিল একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই বাণিজ্যিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎকালীন মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই হিসাব রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। হিসাব রাখতে গেলে সংখ্যার ব্যবহার ছিল জরুরি। এছাড়া, পাটিগণিত, দশমিক গুণন ও জ্যামিতি সম্পর্কে যে তাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল তা বোঝা য়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে। সাধারণত ঋজু ও আনুভূমিক রেখার দাগের মাধ্যমেই সংখ্যা গণনা করা হত। বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রে প্রাপ্ত ইটের মাপের সমতা থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা গণিতবিদ্যার সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত ছিল। সর্বোপরি, বাটখারা ও দাঁড়িপাল্লার উপস্থিতি, বড় বড় শস্যাগার ও স্নানাগার তৈরি ও অত্যন্ত উন্নত ধরনের নগর-পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রয়োগ ঘটেছিল নিশ্চিতভাবে। তবে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল সে-সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। সিন্ধু সভ্যতার যুগে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা কেমন ছিল সেই বিষয়ে কৌতূহল জাগা

খুবই স্বাভাবিক। অনুমিত হয় যে সে যুগে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা (বংশধারা ও পারিবারিক পরিচিতি মায়ের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত) প্রচলিত ছিল। হরপ্পার সমাধিক্ষেত্রগুলির মমাছ বেশ কয়েকটিতে একই বংশলতিকা ভুক্ত নারীদের সমাধিস্থ করা ও মাটির তৈরি প্রচুর পরিমাণ মাতকাদেবীর মূর্তি থেকে এই ধারণা করা হয়েছে। অবশ্য এটা নিতান্তই অনুমান। এছাড়া, সমাধিগুলি থেকে প্রাপ্ত কঙ্কালের দাঁতগুলি পর্যবেক্ষণ করে নৃতাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পুরুষের তুলনায় নারীদের খাদ্যে মাংসের পরিমাণ কম ছিল। নারীদের প্রতি যত্নও নেওয়া হত কম। বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রের বসত বাড়ীগুলিতে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক তকলি থেকে ধারণা করা যায় যে প্রায় প্রতি বাড়ীতেই নারীরা হাতে সূতা কাটত। এছাড়া মাটির তৈরি কয়েকটি মূর্তি থেকে বোঝা যায় যে পাথরের ওপর বেলনা দিয়ে শস্যদানা চূর্ণ করত নারীরা। সুতরাং নারী-পুরুষের বৈষম্য অস্বীকার করা যায় না।

মৃত্যুর পর মানুষের সমাধি দেওয়ার প্রথা বলবৎ ছিল হরপ্পা সভ্যতায়। অর্থাৎ সমাধি ছিল এই সভ্যতার একটি অতি প্রচলিত রীতি। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে খননকার্যের ফলে ৫৭টি সমাধিক্ষেত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণত তিন ধরনের সমাধির প্রচলন তখন ছিল। এগুলি হল আসবাবপত্র ও ব্যবহার্য সামগ্রী যথা-বিভিন্ন পাত্র, ব্যক্তিগত গহনা প্রভৃতিসহ পূর্ণ সমাধি, আংশিক সমাধি এবং দেহাবশেষের আধার বা পাত্র সমাধি। মৃতব্যক্তির দেহকে সমাধিক্ষেত্রে উত্তর থেকে দক্ষিণে শায়িত করা হত। উত্তরদিকে মাথার পাশে রেখে দেওয়া হত সেই ব্যক্তির ব্যবহার্য জিনিসপত্র। এমন কিছু সমাধির নিদর্শন পাওয়া গেছে যেগুলি থেকে বোঝা যায় যে, ইটে ঘেরা একটি আয়তাকার জায়গার মধ্যে সমাধি দেওয়া হত। আবার লোথালে এমন কয়েকটি কবরখানা পাওয়া গেছে যেগুলিতে পাশাপাশি একজোড়া কঙ্কাল অবস্থিত। এগুলির মধ্যে একটি পুরুষের এবং একটি নারীর। পাশাপাশি নারী ও পুরুষের সমাধির অবস্থান থেকে ব্রিজেৎ অলচিন ও রেমন্ড অলচিন মনে করেন যে, হরপ্পা সভ্যতায় হয়ত পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের সতীদাহ প্রথার ন্যায় কোনো ব্যবস্থা প্রচলন ছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে কোনো পুরুষ মারা যাবার পর তার সমাধির পাশেই তার স্ত্রীর মৃতদেহ সৎকারের রীতি চালু ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য (Features of Harappan Civilisation)

(১) সমসাময়িক যুগে মিশর বা মেসোপটেমিয়াতে যে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল প্যাপিরাস, পোড়ামাটি ও পাথরের বুকে তার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা সেগুলি পাঠ করে তার ইতিহাস রচনা করেছেন। সিন্ধু উপত্যকার সিলমোহর ও বিভিন্ন পাত্রের গায়ে বেশ কিছু লিপি খোদাই করা আছে। সেগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। পণ্ডিতরা তাই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, যথা-ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং মানুষ, পশুপক্ষী ও দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে হরপ্পা সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই কারণে এই সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলা হয়। (২) এই যুগে মানুষ লোহার ব্যবহার জানত না। এ সময় পাথরের ব্যবহার কমে আসতে থাকে এবং ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। পাথরের হাতিয়ার ও সরঞ্জামের পাশাপাশি ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যবহারও চলতে থাকে। তাই এই সভ্যতা তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। (৩) মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন ও মিশর প্রভৃতি বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মতো হরপ্পা সভ্যতাও ছিল নদীমাতৃক সভ্যতা। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীকে কেন্দ্র করে মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতা গড়ে ওঠে।

নীলনদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মিশরের সভ্যতা। তেমনই সিন্ধুনদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠে। (৪) কেবলমাত্র সিন্ধু উপত্যকাই নয়-সিন্ধুতট অতিক্রম করে পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা, গুজরাট, সৌরাষ্ট্র এবং নর্মদা উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ স্থানে এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। মোটামুটিভাবে পশ্চিমে মাকরান উপকূলে একেবারে ইরান ও পাকিস্তানের সীমানায় সুকতাসেনডোর থেকে পূর্বে দিল্লির নিকটবর্তী আলমগীরপুর এবং উত্তরে জম্মুর কাছাকাছি মান্ডা থেকে দক্ষিণে গোদাবরী উপত্যকার দাইমাবাদ পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। আধুনিক পণ্ডিতদের

মতে সমগ্র এলাকাটির আয়তন হল প্রায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে এলাকাটি প্রাচীন মিশরের চেয়ে ২০ গুণ এবং যুগ্মভাবে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার চেয়ে ১২ গুণ বড়ো। এটি হল প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম সভ্যতা। (৫) বর্তমানে হরপ্পা সভ্যতার প্রায় ১৫০০টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে

এবং এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র শহর নামের অধিকারী। নগর-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। এই নগরী দুটির মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার। এছাড়া চানহুদারো, কোটদিজি, রূপার, আলমগীরপুর, লোখাল, রংপুর, রোজদি, সুরকোটরা, কালিবঙ্গান, বানওয়ালি প্রভৃতি স্থানে উন্নত নগর জীবনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। (৬) প্রায় তেরো লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই এলাকাটিতে সর্বত্রই একই ধরনের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতার নগরীগুলির অবস্থানগত দূরত্ব যথেষ্ট, কিন্তু এ. সত্ত্বেও নগরীগুলির পরিকল্পনা, গঠন-রীতি ও জীবনযাত্রার উপকরণে যথেষ্ট মিল আছে। সুতরাং একটি নগর সম্পর্কে আলোচনা করলেই অন্যান্য নগর সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়। এখানে মহেঞ্জোদারো শহরটি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

নগর পরিকল্পনা: দুর্গ অঞ্চল: সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। এখানে প্রায় ১৫০০টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হলেও এর সামান্য কয়েকটি কেন্দ্রই নগর নামের অধিকারী। এইসব নগরকেন্দ্রগুলির মধ্যে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চানহুদারো, কালিবঙ্গান, বানওয়ালি, সুরকোটরা, রোজদি, লোথাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শহরগুলির দুটি এলাকা-উঁচু এলাকা এবং নিচু এলাকা।

মহেঞ্জোদারো শহরটির পশ্চিমদিকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বিশালায়তন ঢিপির উপর একটি দুর্গ ছিল। একে দুর্গাঞ্চল বা Citadel Area বলা হয়। এই অঞ্চল ঘিরে ছিল বিরাট প্রাচীর। কেবলমাত্র মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পাই নয়-ছোটো ছোটো বহু নগরেই এই ব্যবস্থা ছিল। এই দুর্গ অঞ্চলে কিছু ঘরবাড়িও আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়, সেগুলি ছিল শাসকদের বাসস্থান। দুর্গ অঞ্চলেই সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি

বিরাট বাঁধানো স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। তার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট। এর চারদিকে ঘিরে আছে ৮ ফুট উঁচু ইটের দেওয়াল। এর কেন্দ্রস্থলে আছে একটি জলাশয়, যা ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর। জলাশয়ের নোংরা জল নিকাশ ও তাতে পরিষ্কার জল পূর্ণ করার ব্যবস্থা ছিল। ঋতুভেদে জল গরম বা ঠান্ডা করার ব্যবস্থাও ছিল। এই জলাধারের তিনদিকে ছিল বারান্দা এবং একদিকে ছিল ছোটো ২৩ ছোটো কিছু ঘর। ডঃ রামশরণ শর্মা (R. S. Sharma)-র মতে, স্নানের পর পোশাক পরিবর্তনের জন্য। ঘরগুলি ব্যবহৃত হত। স্যার মর্টিমার হুইলার মনে করেন যে, ভারতীয় ধর্মীয় জীবনে স্নানের গুরুত্ব অপরিসীম। স্নানাগারটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত এবং এর সন্নিহিত ঘরগুলি ছিল পুরোহিতদের বাসস্থান। অপরদিকে ডঃ দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী (D. D. Kosambi) এই কক্ষগুলিকে পতিতাদের বাসস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। এরই পাশে ছিল একটি কেন্দ্রীয় শস্যাগার। এর আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট এবং প্রস্থে ১৫০ ফুট। শস্যাগার-সংলগ্ন বিরাট চাতালে শস্য ঝাড়াই-মাড়াই হত। শস্যাগারের পাশেই ছিল শ্রমিকদের বাসস্থান। ডঃ এ. এল. ব্যাসাম এটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্যার মর্টিমার হুইলার বলেন যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে এ ধরনের বিশাল শস্যাগার পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় নি। এই অঞ্চলের অন্যান্য বড়ো বড়ো বাড়ির ধ্বংসাবশেষকে পণ্ডিতরা সভাকক্ষ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সমিতিগৃহ বলে চিহ্নিত করেছেন

মূল শহর: দুর্গ-অঞ্চলের এই উঁচু ঢিপির পূর্বদিকে নিচু জমিতে মূল মহেঞ্জোদারো শহরটি গড়ে উঠেছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা দুটি শহরেরই আয়তন প্রায় এক বর্গমাইল। নগরের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে সমান্তরালভাবে কয়েকটি রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাগুলি ৯ থেকে ৩৪ ফুট চওড়া। রাস্তাঘাটের এই বিন্যাস সচেতন নগর-পরিকল্পনার ইঙ্গিত বহন করে, যা মেসোপটেমিয়া বা মিশরে অজ্ঞাত ছিল। এই রাস্তাগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য গলি। গলিগুলির দু'পাশে নাগরিকদের ঘরবাড়ি। বাড়িগুলি পোড়া ইটের তৈরি এবং অনেক বাড়িই দোতলা বা তিনতলা। প্রত্যেক বাড়িতে প্রশস্ত উঠোন, স্নানাগার, কুয়ো ও নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। অনেক বাড়িতে আবার 'সোকপিট' ছিল বাড়ির নোংরা জল নর্দমা দিয়ে এসে রাস্তার ঢাকা দেওয়া বাঁধানো নর্দমায় পড়ত। নর্দমাগুলি পরিষ্কারের জন্য ইট দিয়ে তৈরি ঢাকা 'ম্যানহোল'-এর ব্যবস্থা ছিল। ডঃ এ. এল. ব্যাসাম বলেন যে, রোমান সভ্যতার পূর্বে অপর কোনো প্রাচীন সভ্যতায় এত পরিণত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ছিল না। ডঃ রামশরণ শর্মা বলেন যে, এই সভ্যতার নর্দমার গুণগত মান ছিল বিস্ময়কর। হরপ্পার পয়ঃপ্রণালীর তো কোনো তুলনাই হয় না। ডঃ কোশাম্বী-র মতে, উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাই সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতা থেকে হরপ্পা সভ্যতাকে পৃথক করেছে। ডি. এন. ঝা (D. N. Jha)-র মতে, উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান এবং এই ব্যবস্থা একটি পৌরসংস্থার অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, সমসাময়িক যুগে মিশর বা মেসোপটেমিয়ায় জলনিকাশী ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। ওইসব দেশে বাড়ির নোংরা জল বাড়ির উঠোনেই জমা থাকত, নালা দিয়ে জল শহরের বাইরে পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেক বাড়ির সামনে বাঁধানো 'ডাস্টবিন' ছিল। কেবলমাত্র বড়ো রাস্তার উপরেই শহরের দোকানগুলি অবস্থিত ছিল। শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে সারিবদ্ধভাবে ছোটো ছোটো কিছু কুঠুরি-ঘর আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয় এগুলি দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষদের বাসস্থান। অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড (Gordon Childe) বলেন যে, হরপ্পার পৌরশাসকরা গৃহ-নির্মাণ সংক্রান্ত আইন-কানুন মেনে চলতেন।

অধ্যাপক ব্যাসাম বলেন যে, রক্ষণশীলতা বা ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৪. খননকার্যের ফলে মহেঞ্জোদারোতে সভ্যতার ন'টি স্তর এবং হরপ্পায় আটটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই ন'টি বা আটটি স্তরের সর্বত্র মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, নগর-পরিকল্পনা, হস্তলিপি, ওজন, মাপ কিন্তু একই ধরনের কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, তবে উপরের স্তরগুলিতে নগর কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার ছাপ স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে যে, উপরের স্তরের ঘরবাড়িগুলি ক্রমশ রাস্তা দখল করছে, গলি ছোটো হয়ে আসছে, নর্দমা বুজে আসছে। এ

সত্ত্বেও নগর-পরিকল্পনা ও জীবনযাত্রার ধারা কিন্তু সর্বত্রই একই রকম।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ (Causes of Decline of the Harappan Civilisation):

দীর্ঘদিনের উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত অস্তিত্বের পর ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ হরপ্পা সভ্যতার দুটি প্রধান কেন্দ্র হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর বিলুপ্তি ঘটে এবং পরবর্তী একশো বা দেড়শো বছরের মধ্যে সমগ্র হরপ্পা সভ্যতা অবলুপ্ত হয়। এই অবলুপ্তির কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা একমত নন। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি পরীক্ষা করে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁরা বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছেন। এইসব কারণের পিছনে কিছু যুক্তি থাকলেও কোনোটিকেই অনিবার্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। আসলে সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। হরপ্পা সভ্যতার বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের কয়েকটি মৌলিক বিষয় মনে রাখতে হবে। (১) সিন্ধু উপত্যকা এবং তার বাইরে যে বিশাল এলাকা জুড়ে এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল, তা কিন্তু সমস্ত এলাকায় একই সাথে বিলুপ্ত হয় নি। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর বিলুপ্তির একশো বা দেড়শো বছর পরেও সুরকোটরা প্রভৃতি অঞ্চলে এই সভ্যতা টিকে ছিল। এরও পরে গুজরাট, রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ভঙ্গুর অবস্থাতেও এই সভ্যতা তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। (২) এই সভ্যতার সকল কেন্দ্রগুলির পতনের পশ্চাতে একই কারণ বা প্রেক্ষাপট ছিল না। দু-একটি নগর বা কেন্দ্রের পতনের কারণ এক হলেও সর্বত্র তা সমান ছিল না। (৩) আকস্মিকভাবে হঠাৎ একদিনে এই সভ্যতার পতন হয় নি। দীর্ঘদিন ধরে ক্রমিক অবক্ষয়ের ফলে সভ্যতাটি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পুড়ে এবং তার পরেই আসে চরম বিপর্যয়, যা সভ্যতাটির বিলুপ্তি ঘটায়।

১) **অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ঃ** সভ্যতার পতনের জন্য অনেকে বিদেশি আক্রমণকে দায়ী করে থাকেন, কিন্তু কেবলমাত্র বিদেশি আক্রমণ একটি সমুন্নত সভ্যতার ধ্বংসসাধন করতে পারে না। অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় পতনের পথকে প্রশস্ততর করলেই বিদেশি আক্রমণ তা ত্বরান্বিত বা সম্পূর্ণ করে। হরপ্পা সভ্যতার অবক্ষয় দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। সভ্যতার নীচের স্তরগুলিতে নাগরিক সভ্যতা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল অনেক উন্নত, কিন্তু উপরের স্তরগুলিতে শোচনীয় অবক্ষয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। বাড়ি-ঘরগুলি রাস্তার উপর উঠে আসছে, গলিগুলি সংকীর্ণতর হচ্ছে, গলিতে ইটের পাঁজা তৈরি হচ্ছে, নর্দমাগুলি পরিষ্কার হচ্ছে না এবং তা ধীরে ধীরে বুজে আসছে। বড়ো বড়ো অট্টালিকার স্থলে তৈরি হচ্ছে ছোটো ছোটো বাড়ি এবং তাও আবার পুরোনো ইট দিয়ে বড়ো বড়ো ঘরগুলি ক্রমশ ছোটো ছোটো কক্ষে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের অবনতি ঘটছে এবং মৃৎপাত্র তার পূর্বগৌরব বজায় রাখতে অক্ষম হচ্ছে। এই কারণে স্যার মর্টিমার হুইলার মন্তব্য করেছেন যে, পরবর্তীকালের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা ছিল তাদের প্রাথমিক পর্বের ছায়ামাত্র বিদেশি আক্রমণের অনেক আগেই অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের ফলে হরপ্পা সভ্যতার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয় এবং বিদেশি আক্রমণের ফলে তার পতন ঘটে। অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের জন্য বেশ কয়েকটি কারণকে দায়ী করা হয়।

(ক) **রক্ষণশীল মানসিকতা:** (হরপ্পাবাসীর রক্ষণশীল মানসিকতা বা মানসিক বন্ধ্যাত্ব এই সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করা সত্ত্বেও তারা যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নিতারা নতুন কিছু শিখতে চাইত না) নতুনকে উপেক্ষা করে তারা পুরোনোকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। এর ফলে তাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমসাময়িক মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা সেখান থেকে কিছু শেখে নি। (১) মেসোপটেমিয়াবাসী খাল কেটে জলসেচের মাধ্যমে ব্যাপক হারে ফসল উৎপন্ন করত। অন্যদিকে হরপ্পাবাসী জলাধার তৈরি করে সেখানে বন্যার জল ধরে রেখে তা চাষের কাজে ব্যবহার করত-তারা খাল খননের কথা চিন্তা করে নি। (ii) হরপ্পাবাসী উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি সম্প্রসারণ, ভারী লাঙলের ব্যবহার, লোহার যন্ত্রপাতি নির্মাণ বা কৃষিব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার কোনো চিন্তা করে নি। (৯৮) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কথাও তারা ভাবতে পারে নি। (iv) এছাড়া, মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। নতুন কিছু শেখার মানসিকতা না থাকায় পরিণতি অবশ্যই মারাত্মক হয়ে ওঠে।

(খ) **প্রাকৃতিক কারণ:** হরপ্পা সভ্যতার পতনের জন্য অনেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণকে দায়ী করে থাকেন।

(i) এ ব্যাপারে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলা হয়। স্যার মর্টিমার হুইলার বলেন যে, প্রথমদিকে সিন্ধু উপত্যকায় প্রবল বৃষ্টিপাত হত এবং এলাকাটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। এখানকার সিলে গন্ডার, হাতি, বাঘ, বাইসন, মোষ প্রভৃতি জীবজন্তুর ছবি উৎকীর্ণ আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই অঞ্চলে এইসব জীবজন্তু বাস করত। সাধারণত বৃষ্টিবহুল স্যাঁৎসেতে অঞ্চলে এইসব জীবজন্তু বসবাস করে। কালক্রমে নগর সভ্যতার সম্প্রসারণ এবং গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে পোড়া-ইট তৈরির জন্য ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে সমগ্র অঞ্চলটি বনশূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমে যায়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে কৃষিকার্যের অবনতি ঘটে, নিকটবর্তী স্থানে মরুভূমি থাকায় এই অঞ্চলের শুষ্কতা বৃদ্ধি পায়, ভূগর্ভস্থ লবণ ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে এবং কালক্রমে স্থানটি উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়। এছাড়া রাজপুতানার মরু অঞ্চলের ক্রমপ্রসারকেও এই সভ্যতার পতনের জন্য দায়ী করা হয়। সিন্ধু সভ্যতার বিনাশ প্রসঙ্গে স্যার অরেল স্টাইন (Sir Aurel Stein)-এর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি ভারত সীমান্তে গেড্রোসিয়া বা বেলুচিস্তানের জনহীন উষরভূমির উপর সমৃদ্ধশালী বসতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তাঁর মতে, বেলুচিস্তানে এই শুষ্কতার সূচনা হয় তাম্র-প্রস্তর যুগ (Chalcolithic Age) থেকে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিকবীর আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে এই শুষ্কতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং তার সেনাদলের পক্ষে এই শুষ্ক মরু অঞ্চল অতিক্রম করা সহজ হয় নি। হরপ্পা সভ্যতা বিনাসের পক্ষে এই ক্রমবর্ধমান শুষ্কতা বহুলাংশে দায়ী ছিল। রাইকস্ (Raikes), ডাইসন (Dison) ও ফেয়ারসার্ভিস (W. A. Fairservis) আবহতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্বের হিসেব-নিকেষ করে জানান যে, সিন্ধু-অঞ্চলের আবহাওয়ায় এ ধরনের কোনো বড়ো পরিবর্তন ঘটে নি।

(ii) (অনেকের মতে, সিন্ধু ও তার শাখানদীগুলি এবং অন্যান্য নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই সভ্যতার পতন ঘটে। সিন্ধুনদ তার গতিপথ পরিবর্তন করলে বন্দর মহেঞ্জোদারো তার গুরুত্ব হারায়। জলাভাব ও শুষ্কতা বৃদ্ধির ফলে মহেঞ্জোদারো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে খাল খনন করে হয়তো এ সমস্যার সমাধান করা যেত, কিন্তু মহেঞ্জোদারোবাসী সে পথে অগ্রসর হয় নি-তারা সম্ভবত নগরটি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। কেবলমাত্র সিন্ধুনদই নয়-শতদ্রু ও যমুনা নদীরও গতিপথ পরিবর্তিত হয়। ঘগ্গর, দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীও জলের অভাবে শুকিয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপর যে এর ফল কত মারাত্মক হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(iii) (অনেকের মতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে হরপ্পার নগরগুলি ধ্বংস হয়েছিল এবং সিন্ধু উপত্যকার নিকটবর্তী অঞ্চলই ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। তাঁদের যুক্তির সমর্থনে তাঁরা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহগুলির কথা বলে থাকেন। কঙ্কালগুলির গায়ে ক্ষতচিহ্ন। সম্ভবত ভূমিকম্পের ফলে ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ার জন্যই মৃতদেহগুলির গায়ে ক্ষতচিহ্ন ছিল এবং মৃতদেহগুলির সৎকার করাও সম্ভব হয় নি (এই মতবাদ সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মহেঞ্জোদারোর ক্ষেত্রে এই মতবাদ প্রযোজ্য হলেও হরপ্পা সভ্যতার অন্যান্য নগরগুলির ক্ষেত্রে ভূমিকম্প-তত্ত্ব খাটে না) উঃ শাঙ্খালিয়া (Dr. H. D. Sankhalia) প্রশ্ন তুলেছেন যে, মহেঞ্জোদারো নগরটি ধ্বংস হলে তার অধিবাসীরা পর পর সাতবার তার পুনর্নির্মাণ করে থাকলে ভূমিকম্পের পর কেন তারা আর তার পুনর্নির্মাণ করল না?)

(iv) রাইকস্ (Raikes), ডেলস্ (Dales), আরনেস্ট ম্যাকে (E. J. H. Mackay), এস. আর. রাও (S. R. Rao), সাহানী (Sahani) প্রমুখেরা পতনের কারণ হিসেবে বন্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এম. আর, সাহানী-র মতে, "প্লাবন সিন্ধু-সংস্কৃতিকে ভাসিয়ে দেয়।" ("Floods may have swept the Indus Culture.")। স্ট্রাইকস্ বলেন যে, "সিন্ধু নদের জল অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে ক্রমাগত বন্যা ও প্লাবন হচ্ছিল, এবং এর ফলেই সিন্ধু সভ্যতার বিলোপ ঘটেছিল।' সিন্ধু নদের বুকে পলি জমে নদীগর্ভ উঁচু হয়ে ওঠে। এর ফলে বর্ষায় নদীর জল দু-কূল ছাপিয়ে শহরকে প্লাবিত করতে থাকে মহেঞ্জোদারো নগরটি যে অন্তত তিনবার বন্যার দ্বারা প্লাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই বন্যার হাত থেকে মহেঞ্জোদারোর নগরদুর্গকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ৪৩ ফুট চওড়া একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয় এবং দুর্গ-

সংলগ্ন পয়ঃপ্রণালীর উচ্চতা ১৪ ফুট বাড়ানো হয় শহরে বাড়ির ভিতরে যাতে জল ঢুকতে না পারে, সেজন্য বাড়ির ভিত উঁচু করা হয় এবং বাড়ির যে সব অংশে বন্যার জল লাগতে পারে, সে সব অংশ পোড়ামাটির ইট দিয়ে তৈরি করা হয়। চানহুদারো, লোখাল, দেশলপার, রংপুর, ভগতরব প্রভৃতি স্থানে বন্যার চিহ্ন স্পষ্ট। আবার অন্যদিকে হরপ্পা, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানে নগর ধ্বংসের জন্য বন্যার কোনো ভূমিকা নেই। অনেকে মনে করেন যে, কেবলমাত্র বন্যা এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত এই সভ্যতার বিনাশ ঘটাতে পারে না। রাইকস্ বলেন যে, কোনো সাধারণ বন্যা নয়-ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনজনিত একটি ভয়াবহ বন্যাই হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। আবার অনেকের মতে, এ ধরনের বন্যার কোনো ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ নেই।

(v) প্রত্নতাত্ত্বিক পোজেল বলেন যে, সিন্ধুবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনে দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে এই অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলকে নির্মমভাবে ব্যবহার করেছিল। এর ফলে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আর জীবনধারণের জন্য জমিতে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপন্ন হচ্ছিল না এবং ক্রমাগত ধ্বংস হওয়ায় জীবজন্তুদের বংশও লোপ পেয়েছিল। এর ফলে এই অঞ্চলে প্রবল খাদ্যসংকট দেখা দেয় এবং হরপ্পা সভ্যতা বিলুপ্ত হয়। এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় কারণ হরপ্পা সংস্কৃতি পাঁচশো বছরের অনেক বেশি দিন স্থায়ী হয়েছিল, এবং পাঁচশো বছরের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে কৃষি-উৎপাদন নিঃশেষিত হয়ে যাবে-এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) বর্বর সংস্কৃতির প্রভাব: হরপ্পা সভ্যতায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই বড়ো বড়ো ঘরগুলি ছোটো ছোটো আকারে ভাগ করা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনগ্রসর এলাকায় হরপ্পা সংস্কৃতির দ্রুত প্রসার লাভের ফলে ওইসব অঞ্চলের বর্বরতা এই সংস্কৃতিকে গ্রাস করে। এর ফলে হরপ্পা সংস্কৃতি মলিন ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। এই মত এখনো পর্যন্ত অনুমানমাত্র-তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে, এই সংস্কৃতির অবনতি এবং অবসানের জন্য অভ্যন্তরীণ কারণ যতটা দায়ী ছিল, বিদেশিদের আক্রমণ ততটা দায়ী ছিল না।

(৩) আর্য আক্রমণ: বলা হয় যে বন্যা, মহামারী, সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তন বা জলবায়ু পরিবর্তন-যে কোনো কারণেই হোক না কেন, হরপ্পা সভ্যতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং শেষপর্বে তাঁর পতন ঘটেছিল রক্তাক্ত পথে। বলা হয় যে, সিন্ধু উপত্যকায় খননকার্য চালিয়ে রান্নাঘর, কুয়োর ধার, রাস্তা প্রভৃতি স্থানে যত্রতত্র স্তূপীকৃত কঙ্কাল পাওয়া গেছে-যাদের মাথার পিছনে ভারী অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। এইসব মৃতদেহগুলির কোনো সৎকার হয় নি। অনেকে মনে করেন যে, রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের ফলেই হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটেছিল, এবং বিভিন্ন স্থানে সৎকার না হওয়া স্তূপীকৃত মৃতদেহগুলি হল তারই প্রমাণ।

হুইলার, স্টুয়ার্ট পিগট, গর্ডন চাইল্ড, অলচিন-দম্পতি প্রমুখরা মনে করেন যে আর্যদের আক্রমণের ফলে এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই মতবাদের সমর্থনে কিছু যুক্তি উপস্থিত করা হয়। (i) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং মাথার খুলিতে আঘাতের চিহ্নসহ সৎকার না হওয়া স্তূপীকৃত মৃতদেহগুলি প্রমাণ করে যে, আকস্মিক আক্রমণের ফলে এইসব নগরবাসী নিহত হয়েছিল।

পণ্ডিতদের মতে আর্যরাই ছিল আক্রমণকারী। (ii) ভারতে আর্যদের আগমনকাল এবং হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের সময় অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। এ দুটির সময়কাল আনুমানিক ১৫০০-১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। (iii) ঋগ্বেদে বর্ণিত 'হরিযুপীয়ার যুদ্ধ'-কে হুইলার-সহ অনেকেই হরপ্পার যুদ্ধ বলে মনে করেন। (iv) ঋগ্বেদে দেবরাজ ইন্দ্রকে 'পুরন্দর' বা নগরের ধ্বংসকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আর্যদের আক্রমণকালে ভারতে হরপ্পা সভ্যতা ব্যতীত অপর কোনো নগর সভ্যতা ছিল না।) (v) চানহুদারো, ঝুকর প্রভৃতি স্থানে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি এক ধরনের ঋজু ও লম্বা কুঠার পাওয়া গেছে। স্থানীয় কুঠারের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, বরং ইরানীয় কুঠারের সঙ্গে এর মিল আছে। যেহেতু আর্যরা ইরানের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল, তাই এই কুঠারকে আর্যদের কুঠার বলে মনে করা হয়।

এই মতবাদের কিছু দুর্বলতা আছে। (i) মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত কঙ্কালগুলির দ্বারা একমাত্র আর্য আক্রমণ প্রমাণিত হয় না। এর জন্য গৃহযুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণকেও দায়ী করা যায়। (ii) আর্য আক্রমণে মহেঞ্জোদারো ধ্বংস হলেও সিন্ধুর অন্যান্য শহরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রমাণ নেই। (iii) আক্রমণকারীরা যে আর্য ছিল তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। (ম্যাকের মতে, আক্রমণকারীরা ছিল বেলুচিস্তানের অধিবাসী। সুতরাং আর্য-আক্রমণ তত্ত্ব সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের জন্য কোনো একটি কারণকে দায়ী করা যায় না। তবে এর পতনের জন্য যে কারণই দায়ী থাক না কেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় এর প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অন্য কোনো কারণ, যা এই সভ্যতার সমাধি রচনা করে।

Socio-economic Life of Harappan People:

সামাজিক জীবন (Social Life):

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ:

শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শহরের ঘরবাড়ি ও অন্যান্য উপকরণ দেখে মনে হয় যে সমাজে শাসক সম্প্রদায়, ধনী ও ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগরেরা বাস করত। দুর্গ অঞ্চলেই ছিল শাসকদের বাসগৃহ। শহরের দ্বিতল-ত্রিতল গৃহগুলিতে বাসকরত ধনী ও মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায় এবং খুপরি জাতীয় ঘরগুলি ছিল শ্রমজীবী দরিদ্রদের বাসস্থান। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, এই শহরগুলিতে ক্রীতদাসরাও ছিল। তারা দীনহীন কুটিরে বাস করত এবং ফসল মাড়াই, ভারী বোঝা বহন, শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ করত। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা উভয় শহরেরই উত্তর-পূর্ব কোণ, দুর্গপ্রাকার ও শস্যাগারের কাছাকাছি স্থানসমূহে খুপরি-জাতীয় ঘরগুলির অস্তিত্ব শহরে ক্রীতদাস ও দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে। কালিবঙ্গান ও লোথালে এ ধরনের কোনো খুপরি মেলেনি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই শহর দুটির শাসকরা হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর শাসকবর্গ অপেক্ষা উদার ছিলেন। অধ্যাপক ব্যাসাম মনে করেন যে, হরপ্পা সভ্যতায় মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যাধিক্য ছিল।

খাদ্য:

এই সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হলেও তার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। শহরগুলির সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্য চলত। সিন্ধু নদের বন্যায় কৃষিক্ষেত্র ছিল উর্বর। সংশ্লিষ্ট এলাকার নদীগুলিতে বারো মাস জল থাকত। একারণে চাষের জলের অভাব হয় নি। এছাড়া অতিরিক্ত জল-সংরক্ষণের জন্য চারদিকে মাটির আল দিয়ে জল ধরে রাখা হত। কৃষিকাজের জন্য কাঠের ফলাযুক্ত লাঙল ব্যবহৃত হতো। পাথরের কাস্তেও ব্যবহৃত হত ফসল কাটার কাজে। এখানকার অধিবাসীরা গম, যব, বার্লি, ভাত, ফলমূল, তিল, মটর, রাই, খেজুর, বাদাম, শাক-সবজি ও মুরগি, ভেড়া, গরু ও বিভিন্ন পাখির মাংস, দুধ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত। মাছ এবং ডিম তাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পশু-পাখি :

বিভিন্ন পশুর কঙ্কাল, শিশুদের খেলনা এবং বিভিন্ন সিলে অঙ্কিত চিত্র থেকে হরপ্পার পশু-পাখি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গরু, মহিষ, ভেড়া, উট, হাতি, শূকর, কুকুর ও ছাগল। এছাড়া বাঘ, সিংহ, হাতি, বাইসন, গণ্ডার, ভল্লুক, খরগোশ তাদের অজানা ছিল না। বিভিন্ন সীলে উৎকীর্ণ এদের ছবি এবং পোড়ামাটির মূর্তি এদের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। বেলুচিস্তানে মাটির নীচে অতি গভীরে ঘোড়ার চিহ্ন মিললেও ঘোড়া কিন্তু সেদিন পোষ মানে নি। পোড়ামাটির তৈরি অশ্বমুর্তি লোখালে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ ওঅলঙ্কার:

সিন্ধুবাসী সুতি ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। তারা দেহের উর্ধ্বাংশ ও নিম্নাঙ্গ দুইখণ্ড বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করত। নারী-পুরুষ উভয়েই লম্বা চুল রাখত। মেয়েরা সোনা ও রূপার ফিতে দিয়ে নানা ধরনের খোঁপা করত। তারা নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি এবং তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা ও পাথরের তৈরি নানা ধরনের ও নানা আকারের হার, কানের দুল, চুড়ি, আংটি, মল, কোমরবন্ধ ও মালা ব্যবহার করত। সুরমার ব্যবহার তাদের অজানা ছিল না।

গৃহস্থালির সরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র এবং আমোদ-প্রমোদ:

পাথর, মাটি, তামা, সিসা, ব্রোঞ্জ ও কাঠের তৈরি বাসনপত্র ও গৃহস্থালির নানা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বাটি, জগ, মাদুর, খাট, চেয়ার, টুল, আয়না, চিরুনি, কাঁচি, সুচ, ক্ষুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের তৈরি কুঠার, বর্শা, তির, ধনুক, মুশল প্রভৃতি অস্ত্রও তারা ব্যবহার করত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সিন্ধু উপত্যকায় ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের কোনো সন্ধান মেলেনি। নৃত্য-গীত, পশুশিকার, পাশাখেলা, ষাঁড়ের লড়াই ও রথচালনা ছিল তাদের অবসর বিনোদনের উপায়।

সিল ও লিপি:

সিন্ধু উপত্যকায় পোড়ামাটি, তামা ও ব্রোঞ্জের প্রচুর সিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। পণ্ডিতদের অনুমান প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই ওইসব সিল তৈরি হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এগুলি ব্যবহৃত হত, কারণ সুসা এবং মেসোপটেমিয়ার নগরগুলিতেও হরপ্পার সিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব সিলে বিভিন্ন জীবজন্তু ও জলযানের চিত্র অঙ্কিত আছে। এ থেকে মনে হয় যে, এইসব জীবজন্তু ও জলযান তাদের সুপরিচিত ছিল। আবার কিছু সিলে কিছু কিছু চিত্র উৎকীর্ণ আছে। হরপ্পাবাসী ছবি এঁকে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। এগুলিই হল 'সিন্ধু লিপি' বা 'হরপ্পা লিপি'। এই লিপি চিত্রলিপি-বর্ণলিপি নয়। চিত্রলিপির স্তর অতিক্রম করা সিন্ধু লিপির পক্ষে সম্ভব হয় নি। এইসব লিপি এখনো পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি-তবে এ কথা ঠিক যে, এই লিপি ডানদিক থেকে বাঁদিকে পড়া হত। পণ্ডিতরা এই লিপির সঙ্গে সুমেরীয়, এলামীয়, হিট্রাইট, মিশরীয়, ক্রীটায়, ব্রাহ্মী, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু লিপির সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

অর্থনৈতিক জীবন (Economic Life):

হরপ্পা সভ্যতার আর্থিক সমৃদ্ধি বহুলাংশে তার সন্নিহিত গ্রামীণ অঞ্চলের উন্নত কৃষি-অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ না হলে নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব সম্ভব নয়। প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং সিন্ধু ও তার শাখানদীর বন্যায় এই অঞ্চল যথেষ্ট উর্বর ছিল। ফসল উৎপাদনের জন্য সার, জলসেচ বা দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন হত না। রবিশস্য হিসেবে গম ও যবের চাষ হত। খারিফ শস্য হিসেবে তুলো, তিল উৎপন্ন হত। সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীতে ধানের চাষ সিন্ধু উপত্যকাতেই প্রথম শুরু হয়। লোথাল ও রংপুর থেকে ধানের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। মুরগি পালনের সুত্রপাতও সিন্ধু উপত্যকায়। এখানে উন্নত জাতের কার্পাস তুলোর চাষ হত-তুলোর চাষেরও শুরু এখানেই। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিরাট অংশ জুড়ে ছিল সুতিবস্ত্র এবং 'সিন্ধু' নাম থেকে মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন, নিশর, গ্রিস ও রোমে সুতিবস্ত্র যথাক্রমে সিন্ধু, সিণ্ডন, সাদিন, সেন্ডাটাস ও সাতিন নামে পরিচিত ছিল। ডাঃ কোশাম্বী, অলচিন (Alchin) এবং অতুল সুর-এর মতে, সিন্ধুবাসী লাঙলের ব্যবহার জানত না। কালিবঙ্গানে প্রাক্-হরপ্পা যুগের লাঙলের সন্ধান মিলেছে। সম্ভবত এ যুগে কাঠের লাঙল ব্যবহৃত হত-তবে তা মানুষে-টানা, না খাঁড়ে-টানা তা বলা দুরূহ।)

শিল্প:

হরপ্পা সভ্যতায় নানা ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল। এইসব শিল্পগুলির মধ্যে বয়নশিল্প, প্রস্তরশিল্প, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প, গজদন্তশিল্প, কাঠের কাজ, চিনামাটির কাজ, ইটশিল্প, অলংকার শিল্প, চুনাপাথরের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। বস্ত্রবয়ন ছিল হরপ্পা সভ্যতার একটি প্রধান শিল্প। এই অঞ্চল থেকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সুতিবস্ত্র রপ্তানি করা হত। প্রস্তর শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই অঞ্চল থেকে পাথরের নানা হাতিয়ার ও বিভিন্ন ভঙ্গির নানা মূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া জেড, কার্নেলিয়ন, ল্যাপিস লাজুলি ও এ্যাগেট প্রভৃতি দামি পাথরের তৈরি নানা শৌখিন দ্রব্যাদি মিলেছে। ধাতুশিল্পীরা তামা, ব্রোঞ্জের নানা দ্রব্যাদি যথা কাস্তে, কুঠার, প্রদীপ, কলসি, ছুরি, বাসন, মূর্তি প্রভৃতি তৈরি করত। সোনা ও রূপার অলংকার নির্মাণেও শিল্পীরা দক্ষ ছিল। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। কুমোরের চাক ব্যবহার করে নানা

আকারের ও নানা ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি হত, সেগুলি আগুনে পুড়িয়ে মজবুত করা হত এবং তাদের গায়ে নানা রং দেওয়া হত। পাত্রগুলির গায়ে আঁকা থাকত লতা-পাতা, ফুল এবং পশু-পাখির ছবি। এছাড়া এখানে মাটির তৈরি নানা মূর্তি ও শিশুদের নানা খেলনা মিলেছে। হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত পোড়ামাটি বা চুনাপাথরে তৈরি সিলগুলিতে বিভিন্ন গাছপালা, পশুপাখি ও দেবতাদের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এগুলি তাদের শিল্প-দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এছাড়া ইটভাটা, কাঠ, চিনামাটি ও হাতির দাঁতের কাজেও বহু মানুষ নিযুক্ত ছিল এখানে বলা প্রায়োজন যে, হরপ্পাবাসীর শিল্পবোধ খুব উন্নত ছিল নাগৃহ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে কোনো শৈল্পিক সুক্ষ্মতাবোধের পরিচয় নেই। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রয়োজন মেটানো।

ব্যবসা- বাণিজ্য:

(হরপ্পার নগর-সংস্কৃতির বিকাশের অন্যতম কারণ হল এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি। ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ধু উপত্যকার এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের বাণিজ্য চলত। বাণিজ্যের জন্য জলপথ ও স্থলপথ-দুই-ই ব্যবহৃত হত। শিল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচামাল আমদানি করা হত। হিমালয় থেকে দেবদারু কাঠ, কর্ণাটক থেকে সোনা, রাজপুতানা থেকে তামা ও সিসা, দক্ষিণ ভারত থেকে সিসা, রাজপুতানা-গুজরাট থেকে দামি পাথর, কাথিয়াওয়াড় থেকে শাঁখ আসত। ভারতের বাইরে বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান থেকে আমদানি করা হত সোনা, রূপা, সিসা, টিন ও দামি পাথর। সিন্ধু উপত্যকা থেকে রপ্তানি করা হত তুলো, সুতিবস্ত্র, তামা, হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা জিনিসপত্র। সুতিবস্ত্র ও তুলো ছিল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। মার্শাল মনে করেন যে ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওইসব স্থানে খননকার্য চালিয়ে হরপ্পার কিছু সিল ও দ্রব্যাদি এবং অনুরূপভাবে ওইসব অঞ্চলের সিল ও দ্রব্যাদি হরপ্পায় পাওয়া গেছে আকাদের একটি প্রাচীন লিপিতে বলা হয়েছে যে, সেখানকার বণিকরা দিলমুন, মাগান ও মেলুহা অঞ্চলে বাণিজ্য করতে যেত। অনেকে বাহরিন-কুয়েত অঞ্চলকে দিলমুন বলে মনে করেন। অনেকে আবার হরপ্পার অন্তর্গত কয়েকটি অঞ্চলকে ওই স্থান বলে মনে করেন। অনেকে মাগান বলতে বেলুচিস্তানের একটি জায়গা এবং মেলুহাকে খোদ মহেঞ্জোদারো বা ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোনো স্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। বলা বাহুল্য, এ সমস্যার এখনো কোনো সমাধান হয় নি। লোখালের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বিশাল বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রমাণ দেয়। লোথাল হল বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর ও পোতাশ্রয়। এখানে একটি প্রকাণ্ড জাহাজঘাট, আগন্তুক জাহাজ রাখার উপযোগী ডক এবং পাথরের তৈরি নোঙর মিলেছে। তখনো মুদ্রার প্রচলন হয় নি। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বাণিজ্য চলত।

যানবাহন ও সামুদ্রিক যোগাযোগ:

স্যার মর্টিমার হুইলার (Sir Mortimer Wheeler) মনে করেন যে, সিন্ধুবাসী পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে উট, গাধা ও ঘোড়া ব্যবহার করত। প্রত্নতত্ত্ববিদ অলচিন (Alchin) বলেন যে, হরপ্পা সভ্যতায় উটের কিছু হাড়গোড় পাওয়া গেলেও গৃহপালিত পশু হিসেবে উটের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। ঘোড়ার ব্যবহারও ছিল খুব সীমিত। সিন্ধুবাসী দু-চাকাবিশিষ্ট ঠেলাগাড়ি এবং গরু, ষাঁড় ও গাধায় টানা গাড়ি ব্যবহার করত। সিন্ধুবাসী সমুদ্রের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। কিছু সিলে নৌকা, মাঝি, মাস্তুল, নোঙর ও জাহাজের ছবি আছে। হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঝিনুকের বালা, হাতা, চামচ এবং মুক্তাখচিত অলঙ্কার পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য, ঝিনুক বা মুক্তা গভীর সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করতে হত। ডঃ ম্যাকে (Dr. Mackey)-র মতে, সিন্ধুবাসী সমুদ্রপথেই মিশর, এলাম ও সুমেরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। এছাড়া লোখালের ধ্বংসাবশেষ হরপ্পাবাসীর সামুদ্রিক তৎপরতার সাক্ষ্য বহন করে।

ওজন ও মাপ:

ওজন ও মাপের ব্যাপারেও সিন্ধুবাসী যথেষ্ট দক্ষ ছিল। এখানে নানা ওজনের বিভিন্ন বাটখারা, ব্রোঞ্জনির্মিত কয়েকটি দাঁড়িপাল্লা এবং ধাতুনির্মিত গজকাঠি পাওয়া গেছে। ওজনের সময় সাধারণত ১৬ ও তার গুণিতক ব্যবহৃত হত, যথা-১৬, ৬৪, ১৬০, ৩২০, ৬৪০ প্রভৃতি। ওজনের ক্ষেত্রে ১৬-র ব্যবহার আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। কিছুদিন আগেও ১৬ আনায় ১ টাকা ছিল। মনে হয় সমগ্র এলাকা জুড়ে একই ধরনের ওজন ও মাপ প্রচলিত ছিল।